উড়ালগদ্য-৫

কাজী জহিরুল ইসলাম

আফটার এ লঙ ওয়ে

পোয়েটস ফোরামের তৃতীয় সভাটি পার হবার পরেই একটা সঙ্কটে পড়ে গেলাম। আমাদের বসার কোনো জায়গা নেই। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস, ছয়টায় যথারীতি সাহিত্যের আড্ডা। লোকজন চলে এসেছে কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সভাকক্ষে অফিশিয়াল মিটিং চলছে। একটি মাত্র উপায় আছে, মিশন সদর দপ্তরের ছাদের ওপরের উন্মুক্ত ক্যাফেটেরিয়ায় বসা। সবাই রাজী হয়ে গেলো। আকাশ দেখবো আর কবিতা পড়বো। কিন্তু ছাদে গিয়ে টের পেলাম, এখানে, এই উন্মুক্ত স্থানে সভা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই না। তাপমাত্রা তিন ডিগ্রী, চিল্ড ফেক্টরের কারণে তা হিমাঙ্কের নিচে চার/পাঁচের মতো অনুভূত হচ্ছে। সবাই ওভারকোটের ভেতর গুটিশুটি মেরে মাঙ্কি ক্যাপে কান ঢেকে, মাফলারে গলা পেচিয়ে বসেছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে কবিতা না শুনিয়ে কেউ বাড়ি যাবে না। বরফ ঠান্ডা সন্ধ্যায় একদল ওভারকোট পরা মাঙ্কি বসেছে কবিতার আড্ডায়। বান্দরের কাব্যসভা। ঢাকায় একটা কথা প্রচলিত আছে, কবিরা প্রয়োজনে পকেটের পয়সা খরচ করে চা খাইয়েও মানুষকে কবিতা শোনায়। দূর্বোধ্য আধুনিক গদ্য কবিতা শোনার মতো ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বন্ধু-বান্ধবরা সব সময়ই কবিদের এড়িয়ে চলে। কারণ কবিরা নাছোড়বান্দা। দেখা হলেই কবিতা শোনাতে চায়। মাঝরাতে বাতি জ্বালিয়ে স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়ে কবিতা শোনায় নি, এমন কবি ক'জন আছে? এখানকার অবস্থাও প্রায় একই রকম, হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা, রক্ত জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়াছাড়ি নেই, কবিতা পাঠ চলবেই।

এই সভায় একটা সিদ্ধান্ত হলো, সপ্তাহে একদিন আমরা বসবো বটে, তবে সারা সপ্তাহ ধরে ইমেইলে কবিতার আদান প্রদান চলবে। কবিতার ভূত আমাদের ঘাড়ে ভালোভাবেই চেপে বসেছে। খুব শিগগিরই এই পাগলের দলটি চাকরী হারাতে যাচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তৃতীয় বিশ্বের সামান্য কবি, চাকরী করে ডাল-ভাত জুটাই। কবিতা খেলেতো আর পেট ভরবে না। এই বাস্তবতা ওরা না বুঝলেও আমি বুঝি। এরই মধ্যে আমার বেশ কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ হয়ে গেছে। আর ঠিক সে সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ভীষণ সাহিত্যরসিক মানুষ বন্ধু নিজাম আহমেদ প্রস্তাব করলেন ইংরেজীতে ৫০/৬০-টা কবিতা অনুবাদ করে আমার একটি ইংরেজী কবিতার বই প্রকাশের। প্রস্তাবটি আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুললো। কবিতার আড্ডা-ফাড্ডা সব ভুলে গিয়ে দিন-রাত খেয়ে না খেয়ে কবিতা অনুবাদ করা শুরু করলাম। এই পাগলামীর আগুনে এক চামচ ঘি ঢেলে দিলেন আমার স্ত্রী মুক্তি, দুটো কবিতার অনুবাদ তিনি নিজেই করে দিয়ে। এই ভদ্রমহিলার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কবিতা লেখার মতো এই শৈল্পিক পাগলামীটা আজো বেঁচে আছে অনেকটা তার প্রশ্রয়েই। এক পাবলিক ফোরামে তিনি বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি কবি, শুধু এজন্যই আমাকে বিয়ে করেছেন। পাগলের সভায় মহাপাগলের দিগদারি। দূর্ভাগ্যবশত সেই অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিতে পারি নি। তবে উপস্থিত আমার অন্যান্য স্বজাতিরা তার এ বক্তব্য শুনে নাকি খুশিতে ডিগবাজি খেয়েছিলেন। তরুণ কবিদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কবিদেরও বাজার ভালো।

শেষ পর্যন্ত আমার বইটি বের হলো। অতি সৌভাগ্যবশত বইটি বের হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে। বইয়ের নাম দিলাম, 'আফটার এ লঙ ওয়ে'। কসোভোতে কর্মরত ১৬/১৭জন বেসামরিক কর্মকর্তা ছাড়াও ওখানে ছিলেন ১২৬ জনের একটি পুলিশ কনটিনজেন্ট। আর একজন মিলিটারি অফিসার। মিলিটারি অফিসার মেজর আফজাল (এখন লে. কর্নেল, সাভার টেঙ্ক রেজিমেন্টের কমান্ডার) অল্প ক'দিনের মধ্যেই অতিশয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন। ২৬শে মার্চ উপলক্ষে পুলিশ কনটিনজেন্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আয়োজন করেছে কসোভোর সবচেয়ে অভিজাত হোটেল, গ্রান্ড হোটেলে। বইয়ের প্রকাশক নিজাম আহমেদ উদ্যোগ নিলেন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনস্থলে একটা স্টল বসিয়ে বই বিক্রির। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, পাঁচ ইউরো দিয়ে After A Long Way-এর প্রথম কপিটি কিনেছিলেন আজিজ ভাই (বর্তমানে র‍্যাব-এর মহাপরিচালক অজিজ সরকার), অন্যান্যদের মধ্যে যারা সেদিন বইটি কিনেছিলেন তাদের আরো কয়েক জনের নাম এই মুহূর্তে আমার মনে আছে, এসপি রুহুল আমিন, এসপি ওমর ফারুক, জাতিসংঘের পোড় খাওয়া ক'জন অফিসার, আবু সেলিম, জহুরুল হক, মেজর মাহফুজুর রহমান, সিরাজউদ্দৌলা, আব্দুল ওয়াহাব সহ আরো অনেকে। একদিনেই ৭০ কপি বই বিক্রি হয়ে গেলো। আমার আনন্দের আর সীমা রইলো না।

অবাক হওয়ার তখনো অনেক কিছু বাকী আছে। এরাতো সবাই বই কিনলো বাংলাদেশী কবি, এই খাতিরে। জাতিসংঘের অনেক বিদেশী বন্ধু কিনলো সহকর্মী বলে। কিন্তু খুঁজে খুঁজে যারা বই কেনে, প্রকৃত পাঠক, তারা কি আমার বই কিনবে? 'দুগাজিনি' কসোভোর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান। এক মাসের ছুটিতে দেশে যাচ্ছি। মার্গারেট বললো, দুগাজিনিতে তোমার বই দাও। আমি বললাম, এখানে কে আমাকে চেনে, তাছাড়া কবিতার বই পুশিং সেল ছাড়া বিক্রি হয় না। যাই হোক, মার্গারেটের কথায় দুগাজিনিতে ২০ কপি বই দিলাম।

ছুটি থেকে ফিরে এসে আর দুগাজিনিতে খোঁজ নিতে যাই নি। ঢাকার কোনো বইয়ের দোকানে এক মাসে অচেনা কোনো কবির এক কপিও বই বিক্রি হয় না, এই খবরতো আর আমার অজানা না। এর মধ্যে ফাইনান্স সেকশন থেকে আমার চাকরী প্রায় যায় যায় অবস্থা। আমার অপরাধ আমি কবি। কবিতার বই বের হয়েছে। সেই বইয়ের মুখবন্ধ লিখেছে আমাদের ডেপুটি চিফ ফাইনান্স অফিসার এক ব্রিটিশ সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ মাইকেল ওয়ার্ড। চাকরী শুধু আমারই যাচ্ছে না, যাচ্ছে মাইকেলেরও। এরি মধ্যে কিছু জনপ্রিয়তাও হয়ে গেলো। মিশনের দুই হাজার দেশী-বিদেশী সিভিলিয়ান আর সাড়ে তিন হাজার পুলিশ প্রায় সবাই আমার নামটা অন্তত জানে। জনপ্রিয়তার সুবিধাটা কাজে লাগিয়ে কসোভোর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটা চাকরী জোগাড় করে ফেললাম প্রায় রাতারাতিই।

নতুন অফিসের উল্টোদিকে, মাদার তেরিজা রোডের ওপাশেই দুগাজিনি। অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন গেলাম দুগাজিনিতে। গিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে যেখানে আমার বইগুলো রাখা ছিলো, শেলফের ওখানটায় ঘুরঘুর করছি। বইগুলো দেখতে না পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বোধ হয় অচল মাল বলে সরিয়ে ভেতরে কোথাও রেখে দিয়েছ। কাউন্টারে গিয়ে জর্জ বার্নার্ড শ সেজে গেলাম। জনাব, আপনাদের কাছে কি কাজী ইসলামের কবিতার বই আছে। কাউন্টারে বসা মধ্যবয়সী সুন্দরী আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আফটার এ লঙ ওয়ে'? আমি শুধু চমকে উঠলাম না, আনন্দে ঘামতে শুরু করলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ওর কি অন্য কোনো বই আছে? সে জানালো, আছে হয়ত, আমরা জানি না। তবে এই বইটাই আমাদের কাছে ছিলো, শেষ হয়ে গেছে।

রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, এখন কি মুখোশ পরে টাকা চাইতে যাবো?

আবিদজান
২৩/০২/০৬